## সাহিত্যের মানচিত্রে বীরভূম একটি অন্যতম নাম

# ড. আদিত্য মুখোপাধ্যায়

## আলোচনা করেছেন বীরভূমের সুফি সমাজ নিয়ে

কোরাণে রয়েছে 'ওয়াত্তাকু রাব্বাকুম' অর্থাৎ তোমার 'রব' সম্বন্ধে তুমি নিজেই সচেতন এবং সাবধান হও। আর ইসলামের অন্যতম শিক্ষা হলো- 'মান আরাফা নাফ সুহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু', অর্থাৎ যে নিজেকে চিনতে পেরেছে- জেনেছে সে প্রতিপালক বা আল্লাকে চিনেছে এবং জেনেছে। বাংলার বাউল বলেছে- 'আমি আমি করি কিন্তু আমার ঠিক হইল না। অথবা 'আপ্‌নাকে চিন্‌তে কেটে যায় জীবন।' বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বলেছেন- 'আপনাকে এই চেনা আমার ফুরাবে না।' আসলে লক্ষ্যস্থলের ভিন্নতা নেই কোনখানেই। সে সুফিবাদেও। তবে সুফিদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো কথা- তাঁরা মানব মহাসম্মিলনের বার্তা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন আরব-পারস্য-তুরস্ক থেকে এদেশে। তাঁরা মুসলমান অমুসলমান ভাগ না করে মানুষকে মূল্য দিয়েছেন সবার উপরে। তাতে বহু ক্ষেত্রে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে গোঁড়াদের সঙ্গে। তবু তাঁরা এদেশে এবঙ্গে মানব-মিলনেরই সম্প্রীতির দেবদূত হিসেবে কাজ করে গেছেন। তাঁদের প্রভাবেই 'সত্যপীর', তাঁদের প্রভাবেই 'বরুণ-খিজির' প্রমুখ সম্মিলনের দেবতাদের উদ্ভব হয়েছে। সুফি-পির-ফকিরের ভূমিকা তাই, সমাজের অনেক গভীরে। এঁরা একসময় কাফের পদবাচ্যও হয়েছিলেন তথাপি তাঁদের কর্মপন্থার কোন পরিবর্তন হয়নি।

ইসলাম ধর্ম এবং ঐস্লামিক-সংস্কৃতির দুটিই প্রায় অভিন্ন বিষয়। তথাপি দেশকালের ভিত্তিতে সাম্যবাদের মানবিকতায় ইসলাম কখনও কখনও ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যবর্তী জায়গায় দাঁড়িয়ে মানবপ্রেমের সাম্যবাদ বিকশিত করেছে। সেই-ই সুফি মতবাদ। সুফিবাদের মূল উৎস হলো পবিত্র কোরাণ এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সুফি হলেন হজরত মহম্মদ। সর্বধর্ম সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই সুফিবাদের জন্ম। ভারতে দশম শতাব্দীর শেষ এবং একাদশ শতাব্দীর শুরু থেকেই সুফিরা আসতে শুরু করেছেন। সুফিদের সাধনা এক অতীন্দ্রিয় ভাবরাজ্যের সাধনা। প্রথম যুগের সুফিরা বলেছেন 'প্রেমই ঈশ্বর'। তাই ঈশ্বরের প্রতি প্রেম জাগলেই মানুষের প্রতি ভালোবাসা জন্মায়। হাফিজ, সাদী, রুমি, ওমর খৈয়াম প্রমুখ উদারপন্থী পারসিকদের রচনায় সুফিবাদের পূর্ণ বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। ভারতে সুলতানি-যুগে সুফিবাদের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। আলোচকদের মতে বৌদ্ধধর্ম, হিন্দু বেদান্ত দর্শন এবং অন্যান্য ধর্মীয় উদার আদর্শের সমন্বয়েই সুফিবাদের জন্ম। ইউসুফ হোসেনের মতে- "ইসলামের বক্ষদেশ থেকেই সুফিবাদের জন্ম। সুফিবাদ হলো ইসলামের রূপান্তর।" কোরাণের শিক্ষা আর মহম্মদের জীবন তাঁদের মূল আদর্শ। তথাপি তাঁরা ইসলাম প্রবর্তিত সব ধর্মাচরণ মানতেন না। তাঁরা মনে করতেন পবিত্র অন্তরেই ঈশ্বর অবস্থান করেন। 'সুফি' অর্থে তাঁরা 'সাফ' বা 'সাদা' বুঝিয়েছেন। বৌদ্ধ ও হিন্দুদের অহিংসা-ত্যাগ-উদারতা-বৈরাগ্য-ঈশ্বরে আত্মনিবেদন-উপবাস-যোগসাধনা-সমন্বয় ইত্যাদিকে আশ্রয় করেই সুফিরা গভীর ধর্মভাবের জীবন যাপন করতেন। প্রাণায়াম-অলৌকিক আচরণের সঙ্গে সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তা এবং গুরুশিষ্য সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান ছিল সুফিদের আচরণবিধি। আর এগুলিই আকর্ষণ করতো সাধারণ মানুষজনকে। ভারতে সুফিরা এসেছেন মূলত তুর্কি আক্রমণের পর। অর্থাৎ ১২০২ খ্রিষ্টাব্দের পর। তবে তখন তাঁদের 'সিলসিলা' বা গোষ্ঠীর কথা স্পষ্ট ভাবে জানা যায়নি। স্থান ও নামভিত্তিক ১৯টি 'সিলসিলা' উল্লিখিত হলেও, ভারতে ১৪টির মধ্যে তা সীমাবদ্ধ। পিরের কর্মকেন্দ্রকে বলা হয় 'দরগা' বা 'খান্‌কা'। সুফি ধর্মের অনুগামীদের বলা হয় 'ফকির' বা 'দরবেশ'।

দ্বাদশ শতকের মধ্যেই (১১৯২ খ্রিঃ, সম্ভবত) মইনুদ্দিন চিশ্‌তি ভারতে আসেন। কিছু সময় দিল্লিতে বসবাসের পর তিনি আজমীরে চলে যান। তিনি ভারতে 'চিশ্‌তি' সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর লেখা কোনো বই-এর সন্ধান পাওয়া যায় না। খাজা মইনুদ্দিন চিশ্‌তি নিম্নবর্গের নির্যাতিত হিন্দুদের মধ্যে ধর্মপ্রচার করতেন। এই সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য সন্ত ছিলেন নিজামুদ্দিন আউলিয়া। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন কবি আমীর খসরু এবং ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বরণী। সুলতান আলাউদ্দিন খলজীও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ভারতে ধর্ম-সমন্বয়ের ভক্তিবাদে সুফিসাধকের ঐতিহাসিক অবদান রয়েছে। 'চিরাগ-ই-দিল্লী' বা 'দিল্লির আলো' হিসেবে মইনুদ্দিন ছিলেন পরিচিত। সুফিদের মধ্যেও কয়েকটি বিভাগ দেখা যায়। পাঞ্জাব-মুলতান এবং বাংলার মধ্যে সুহ্‌রাবর্দি সম্প্রদায়ের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ ছিল। শেখ শিহাবউদ্দিন সুহ্‌রাবর্দি ও হামিদউদ্দিন নাগোরী ছিলেন এই সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট সন্ত। 'চিশ্‌তি' সম্প্রদায় মনে করতো অর্থ সম্পদ এবং রাজনীতি ধর্ম জীবনের উন্নতিতে বিঘ্ন ঘটায়।

'সুহ্‌রাবর্দি'দের মত্ ছিল ভিন্ন। তথাপি "গুরুর প্রতি অখণ্ড আনুগত্য, সমস্ত জীবের প্রতি অকৃত্রিম প্রেম, ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ" সুফিবাদের মূল ভিত্তি হিসাবে হিন্দু ও মুসলমান নির্বিশেষে সকলকেই আশ্রয় ও দীক্ষা দিয়েছিল। ভারতীয় সমাজ এবং জনজীবনে তৎকালে সুফিবাদ এক গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্রথমতঃ সুফি-সন্তদের সরলতা, মানবতা, ভাগবৎ প্রেম, আড়ম্বরহীন জীবনযাপন, নিরুপম চরিত্র সাধারণ মানুষকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করেছিল। ফলে ভারতের মাটিতে ধর্মীয় উত্তেজনা এবং গোঁড়ামি খানিকটা হলেও হ্রাস পেয়েছিল। তাছাড়া ইসলামের সামাজিক-সাম্য এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শ সুফিরা মেনে চলতেন। সামাজিক-সাম্য ও সুদৃঢ় চরিত্র প্রতিষ্ঠায় তাঁরা সুরাপান-জুয়াখেলা-জাতিভেদ-ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। কাওয়ালি সঙ্গীতের বিকাশেও সুফি প্রভাবিত সম্রাট খসরুর স্পষ্ট ভূমিকা ছিল। ইসলাম ধর্মে সঙ্গীত অনেকাংশে বর্জনীয় হলেও সুফিরা মনে করতেন- 'সঙ্গীতের মাধ্যমেই পরমাত্মার সঙ্গলাভ এবং আনন্দ পাওয়া সম্ভব।' তাঁরা শুধুমাত্র ধর্মচর্চাই করতেন না, সুফিদের খানকা-দরগাগুলি বিদ্যাচর্চা ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসাবেও গড়ে উঠেছিল। সুফিদের প্রভাবেই ইসলামের ভারতীয়করণ ঘটে এবং মুসলমান শাসকরাও সেই আদর্শে বহু ক্ষেত্রেই প্রভাবিত হন। সুফি-সন্তরা ভারতকে তাঁদের স্বদেশ এবং ভারতবাসীকে তাঁদের স্বজন মনে করতেন। মানবপ্রেমকে মূল্য দিতেন সবার উপরে। বৌদ্ধ-তন্ত্র-যোগ সাধনার আশ্রয়ে সুফি-মতবাদই পুষ্ট করেছে চৈতন্যদেবকে। সুফিরা শুধুমাত্র ধর্মপ্রচার-ধর্মান্তরকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না, তাঁরা মানবপ্রেমের বার্তা নিয়ে এসেছিলেন। ধর্মান্তরকরণের মাধ্যমে হলেও বর্জিত-অধঃপতিত-নির্যাতিত হিন্দু-বৌদ্ধদের আশ্রয়ও দিয়েছিলেন।

ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখা থেকে জানা যায় বিহার অঞ্চলে যে সব আর্যরা প্রথমে এসে বসবাস শুরু করে তারা গৃহবাসী কৃষাণ জাতীয় ছিল না তারা ছিল যাযাবর জাতীয়। তারা তাদের সঙ্গে ঘোড়া-গোরু-ছাগল-ভেড়া নিয়ে ঘুরে বেড়াতো। এরাই 'ব্রাত্য-আর্য'। বুদ্ধদেব বা উপনিষদের কালেও বাংলাদেশে আর্যদের আগমন ঘটেনি। তবে 'ব্রাত্য-আর্য' আর 'বেদমার্গী' আর্যরা আগে মগধ অঞ্চলেই উদ্ভব হয়েছিল। কিন্তু 'বৈদিক ধর্মমত' সবার ভালো লাগেনি। তাই তাদের অনেকেই জৈন এবং বৌদ্ধধর্মমতের দিকে এগিয়েছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে মহাবীর বীরভূমের উপর দিয়ে 'রাঢ়' পরিভ্রমণ করেছিলেন। বুদ্ধদেব কুশিনগরে যাবার কালে একবার বীরভূমের উপর দিয়ে হেঁটেছিলেন। চৈতন্যদেবও কাটোয়ায় দীক্ষা নেবার পর পাঁচশ বছর আগে 'রাঢ়' ভ্রমণের কালে বীরভূমের সিউড়ির কাছে পানুড়িয়া পর্যন্ত এসেছিলেন। হিন্দুধর্মের রক্ষণশীলতার কালে পাল-সেনযুগের শেষলগ্নে, 'বর্মন যুগে' এবং ইসলামের অধিকারের কালে তথাকথিত নিম্নবর্গীয় হিন্দুরা একটু আশ্রয় আর নির্বিঘ্নে বাঁচবার প্রত্যাশায় শাসককূলের দিকে এগিয়েছিল। তারা বহুক্ষেত্রেই সুযোগ সুবিধা বেশি ভোগের আশায় ধর্মান্তরিত হয়েছিল স্বেচ্ছায়, আবার বহু ক্ষেত্রে তাদের প্ররোচিতও করা হয়েছিল ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্য। ঠিক এমন দোলাচলের ক্ষেত্রে সুফি-সাধকেরা বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিল তাদের পালিত আচার-ব্যবহারে। তখন দলে দলে মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। পরেই আবার চৈতন্য-নিত্যানন্দ-বীরচন্দ্রের আঁচালাতেও ঠাঁই হয়েছে বহু পতিত জনের। শৈব-তন্ত্র-নাথধর্ম বৌদ্ধের শেষ-অবশেষ হিসেবে তখনও বেঁচে থাকবার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে নিজেদের নানান অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড প্রদর্শনের মাধ্যমে।

বীরভূম জেলাতেও বহু পির-পয়গম্বর-সুফি-সন্ত এসেছেন বাইরের দেশ-রাজ্য থেকে আবার এখানেরও বহুজন নিজের আচরণের নিরিখে পরিণত হয়েছেন সুফি-সাধকে। ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বীরভূম গেজেটিয়ার' -এ এল.এস.এস. ওম্যালি উল্লেখ করেছেন মকদুম-নগর গ্রামে ষোল শতকে একজন সুফি-সাধক এসেছিলেন, তিনি নানান অলৌকিক কাণ্ড করতে পারতেন এবং গৌড়ের নবাব বংশে বিয়ে করেন। এঁর নাম ছিল 'মকদুম সৈয়দ শাহ্ জহিরুদ্দিন'। তাঁর নামানুসারেই গ্রামটির নাম পরবর্তীকালে হয়েছে 'মকদুম-নগর'। গ্রামে ঢুকতেই মকদুম সাহেবের মাজার, পাশেই তাঁর স্ত্রী এবং প্রথম শিষ্য তেজনারায়ণ ঘোষেরও মাজার রয়েছে। দরবেশ-ফকিরের দেশ বীরভূম। সুফি-সাধকেরা শুধুমাত্র মানবসেবার জন্যই সুদূর আরব-পারস্য বা তুরস্ক থেকে ঘোড়ার চড়ে বাংলায় এসে সর্বধর্ম সমন্বয়ের গান গেয়ে গিয়েছেন। সেকেন্ডার জমিদার খান বাহাদুর সাহেব জেলার পাথরচাপুড়িতে দাতাবাবার মাজার এলাকায় প্রথম মেলার পত্তন করেন, যা আজ দেশে-বিদেশে সুখ্যাত। এই সেকেন্ডা-মকদুম নগর এলাকাতেই এসেছিলেন ৩৮ জন সুফি সাধক-অলি। এতজন পির-ফকির-অলি-দরবেশ রাজনগরেও আসেননি। এঁদের প্রায় সবারই সমাধি আছে এই এলাকায়। বহু কবরেই আজও প্রদীপ-ধূপ জ্বালানো হয়। তাঁরা তো একদিন আলো জ্বালাতেই এসেছিলেন এই বীরভূমে, রুক্ষ-রুক্ষ-জঙ্গলমহলে !

বীরভূমের বারা গ্রামে এসেছিলেন প্রায় ৪৫ জন পির। তার মধ্যে লোহাজঙ্গ সাহেবের মাজারে বিপদের দিনে বহু মানুষ আজও ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ শুনতে পান। তাদের বিশ্বাস, বিপদ থেকে মানুষকে উদ্ধারের জন্য তিনি আজও ঘোড়ায় চেপে ঘুরে বেড়ান। মকদুম সাহেবের পর সেকেন্ডায় এসেছিলেন লাডু পির। বাহারুল্লা পির। গরম দেওয়ান প্রমুখেরা। সেকেন্ডার পির জকিউদ্দিন মকদুম সাহেব নামাজ পড়তেন না বলে তাঁর বাবা বিহার থেকে তাঁকে বিষ পাঠিয়েছিলেন এবং সেই বিষ খেয়ে তাঁর মৃত্যুও হয়। পাথরচাপুড়ির দাতাবাবা যেমন পৃথিবী বিখ্যাত, তেমনিই পৃথিবী বিখ্যাত আর এক পির খুষ্টিগিরির কেরমানি

সাহেব। তিনি নাকি কেরমানের রাজপুত্র ছিলেন। বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজারা এই কেরমানি সাহেবের মাজারের জন্য প্রচুর ভূ-সম্পত্তি দান করেছিলেন। বর্ধমানের রাজা সম্পত্তি দান করেছিলেন পাথরচাপুড়ির দাতাবাবার নামে। রাজনগরের চিমনি বিবি, মীর সাহেব, কেন্দু পির, দেবান পির, আজমীর থেকে আসা চার-ইয়ার, আনজান পিরের কথা বাদ দিলেও সিউড়ি শহরেই রয়েছেন গঞ্জলস্কর পির,দরবার পির। দুবরাজপুরের আলম শা, হজরতপুরের বোখারি পির, নলহাটির আনা শহীদ পির, মাড়গ্রামের জাফর আলি শাহ্ এবং ইউসুফ সাহেব, সিয়ানের মকদুম শা, আলিনগরের চাঁদ পির এমন কতো পির-ফকির লোকশিক্ষক ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন একদিন এই বীরভূমের মাটিতে। এঁদের সবারই মাজার বা সমাধি রয়েছে বীরভূমের মাটিতে। সমন্বয়ের বার্তা নিয়ে একদিন তাঁরা এ জেলায় এসেছিলেন, মানুষের পাশে থেকেছিলেন। এখানের বহু মানুষকে তাঁদের অনুগামীও করেছিলেন। মাঝারিপাড়ার নিজামীবাবা তেমনই একজন পির। বীরভূম এমনিতেই পির-ফকিরের দেশ। এখানের মাটিতেই গেরুয়া ত্যাগের মন্ত্র ছড়ানো রয়েছে। এখানেরই নানুরের কবি চণ্ডীদাস বলেছিলেন- "সবার উপরে মানুষ সত্য" । উদার ধর্মমত ও পথের বিশ্বাসী পির-ফকির সুফি সাধকেরা সবাই বিদেশাগত ছিলেন না। যদিও বহু জনই এসেছিলেন আজমীর-তুরস্ক-পারস্য প্রভৃতি আরব দেশ থেকে। পাইকরে প্রায় তিনশ বছর আগে বাগদাদ থেকে এসেছিলেন গোলাম হোসেন শা। এখনো গ্রামে তাঁর আস্তানা আছে। দুবরাজপুরের আলম শা-র মাজারের খাদিম জালাল শা, দায়েম শা-রা আলম শা-র সারিন্দা বাজিয়ে আজও গান করেন-(১) "আল্লার সনে ভাই মিলবেন যদি / খোদার সানে ভাই মিলবেন যদি / ধুয়ে ফেলোগা রে দেলের মদি।" অথবা (২) "ইমানেরই ঐ যে কিস্তি / বাঁধো ও ভাই মোমিন ও মুসলমান, / এ কিস্তি চলবে না কুনোদিন / পড়ে যাবে বড় তুফান।"

সহস্রাধিক বছরেরও আগে থাকতেই বীরভূমে পির-ফকির-সুফি সাধকদের সমাগম ঘটেছে। বীরভূমের মাটিতে তারা কখনো রুক্ষ, কখনো প্রেমময় থেকেছেন। তথাপি লোকশিক্ষকের কাজ তাঁরা করে গেছেন। দরিদ্র দুর্বল পতিত জনের পাশে দাঁড়িয়ে আশার আলো দেখিয়েছেন। বীরভূম জেলা ধর্ম-সম্মিলনের পরীক্ষাগার। সেক্ষেত্রে পির-ফকির-সুফিদের অবদানও কোনো অংশেই কম নয়। বরং বেশিই। তাঁদের প্রভাবেই বৈষ্ণবধর্ম এত উদার এবং সহনশীল ও ক্ষমাসুন্দর।